TRANSITION TO JAPAN: FROM FEUDALISM TO CAPITALISM

DS 4.1.

১) মেইজি পুনঃস্থাপনের চরিত্র/বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

২) তুমি কি মনে করে মেইজি পুনঃস্থাপনে বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল?

৩) মেইজি জাপানে শিক্ষার অগ্রগতি চিহ্নিত কর।

অথবা, মেইজি জাপানে আধুনিকতার বিকাশের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যশিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪) ১৮৬৮ এবং ১৮৮৯ সালের মধ্যে জাপানের সংবিধানের জন্য গণ আন্দলনের প্রকৃতি কি ছিল?

৫) ১৮৮৯ সালে মেইজি সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৬) সাতসুমা বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

৭) মেইজি পুনঃস্থাপনের পর সামন্তপ্রথার বিলোপ সাধনে কোন কোন কার্যসূচীগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল।

৮) মেইজি জাপানে নতুন ভুমি ব্যবস্থা প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে কতটা পরিবর্তিত করেছিল? অথবা, মেইজি জাপানে কৃষি সংস্কারের প্রভাবের মূল্যায়ণ কর।

৯) “ডাইজোকায়ান” সম্পর্কে কি জান?

১০) জাইবাৎসু কারা?

DS 4.2.

১১) ১৮৯৪-৯৫ সালে চীন-জাপান যুদ্ধের পটভূমি এবং ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর।

১২) ১৯০২ খ্রিঃ ইঙ্গ-জাপান চুক্তির পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ১৯০৪-০৫ সালে রূশ জাপান যুদ্ধে এতি জাপানকে কিভাবে সাহায্য করেছিল?

১৩) রূশ-জাপান যুদ্ধের পটভুমি ও তাৎপর্য ব্যখ্যা কর। রাশিয়ার পরাজয়ের কারণগুলো কি ছিল?

DS 4.3.

১৪) কেন ওয়াশিংটন সম্মেলন ডাকা হয়েছিল? প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় জাপানের অগ্রগামী নীতি সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এটি কি সফল হয়েছিল?

১৫) ১৯৩১-৩২ সালে জাপান কেন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে?

১৬) জাপান কেন পার্ল হারবার আক্রমন করেছিল?

১৭) ১৯৩০-৪০-এর দশকে জাপানে সমরবাদের উত্থানের কারণ ব্যখ্যা কর।

১৮) ১৯১৫ খ্রি; চীনের উপর জাপানের একুশ দফা দাবী সম্পর্কে একটি টিকা লেখ।

১৯) শিমোনেসেকির চুক্তির শর্তগুলি কি ছিল?

২০) ১৯৩০ র দশকের জাপানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন উপত্যকা বলে বর্ণনা করা হয় কেন?

১) মেইজি পুনঃস্থাপনের চরিত্র/বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

- মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সম্রাটের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর সম্রাতই দেশের প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়েছিলেন কিনা এবং মেইজি পুনরুদ্ধারের পর দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলি কিসের ইঙ্গিত বহন করেছিল—তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের নানা ধরনের বিতর্কে লিপ্ত। ঐতিহাসিক E.H. Norman বলেছেন—মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপানের সম্রাট নামতান্ত্রিক শাসক থেকে দেশের প্রকৃত শাসকে পরিণত হন। সেদিক থেকে ঘটনাটি ছিল যথার্থই "পুনঃপ্রতিষ্ঠা"। তাঁর মতে, মেইজি পুনরুদ্ধারের পর জাপানের দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটেছিল ও সম্রাট তাঁর ক্ষমতা হৃত ক্ষমতা পেয়েছিলেন। অনেকটা কাছাকাছি মত দিয়ে জর্জ স্যানসম বলেছেন—১৮৬৮ খ্রিঃ পরিবর্তন সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সম্রাটকে তাঁর পূর্বতন ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু তাঁর মতে এদি পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা চলে না, কারণ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ভিনাক কিন্তু রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি মেনে নিতে নারাজ। তাঁর মতে ১৮৬৮ খ্রি; ঘটনার ফলে সম্রাট প্রত্যক্ষভাবে শাসনক্ষমতা দখল করেননি। পশ্চিম জাপানের গোষ্ঠীসমূহ অর্থাৎ সাৎসুমা, চোসু, তোসা ও হিজেনের নেতৃবৃন্দ দেশের প্রকৃত শাসক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। অনুরূপ মতামত দিয়েছেন ঐতিহাসিক রিচার্ড স্টোরি। তিনি বলেছেন, টোকিওর নতুন সরকারের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক ছিলেন পশ্চিমী গোষ্ঠীসমূহের নেতারা এবং তাঁর একটি মুষ্টিমেয় অভিজাতের শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন। মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরবর্তী জাপানকে নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁরা হলেন সাৎসুমা গোষ্ঠীভুক্ত সাইগো তাকামারি ও ওকুবো তোশিমিচি, চোসু গোষ্ঠীভুক্ত কিদো কোইন, ইটো হিরোবুমি ও ইনোউয়ে কাওরু, তোসা গোষ্ঠীভুক্ত ইতাগাকি তাইসুকে এবং হিজেন গোষ্ঠীভুক্ত ওকুমা শিগেনোবু।

  ঐতিহাসিক মারিয়াস জ্যানসেন মেইজি পুন;প্রতিষ্ঠার প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—১৮৫৩ খ্রিঃ পেরির অভিযান থেকে আরম্ভ করে ১৮৭৭ খ্রিঃ সাৎসুমা বিদ্রোহ পর্যন্ত জাপানে যা ঘটেছিল, তা ছিল একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের আশঙ্কার বিরুদ্ধে জাপানের প্রতিক্রিয়া। মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল এই দ্বিমুখী ক্রিয়াকলাপের অনিবার্য পরিণতি। তাঁর মতে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সাৎসুমা বিদ্রহ পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সর্বশেষ সামুরাই সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া। জ্যানসেন এই সময়টিকে "জাতীয় সুদৃঢ়করণের যুগ" বলে আখায়িত করেছেন। তাঁর মতে মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল একটি জাতীয়তাবাদী বিপ্লব এবং মেইজি শাসকেরা বহিরাগত বিপদের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে প্রতিরক্ষামূলক আধুনিকীকরণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

  জন হ্যালিডে প্রমুখ মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকেরা বলেছেন—১৮৪০-এর দশকের টেম্পো সংস্কার থেকে আরম্ভ করে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের নতুন জাপানী সংবিধান রচিত হওয়া পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে জাপানের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। টোকুগাওয়া শাসনের শেষের দিকে এবং মেইজি শাসনের গোড়ার দিকে জাপানের শিল্পের অগ্রগতিকে উদ্দীপিত করার জন্য অর্থনৈতিক জীবনে একটা কঠোর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল। ১৮৮৯ খ্রিঃ সংবিধান এই নিয়ন্ত্রণকে সুদৃঢ় করেছিল। মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকেরা বলেছেন—মেইজি শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক। টোকুগাওয়া সামন্ততন্ত্র থেকে বিংশ শতাব্দীয় পুঁজিবাদে উত্তরণের সেতু হিসাবে উপরোক্ত সময়কালকে(১৮৪০-১৮৯৯) গড়ে টোলার উদ্দেশ্যেই স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ মেইজি নেতারা গ্রহণ করেছিলেন।

তাকাহাসি বলেছেন—ইউরোপীয় শক্তবর্গ কর্তৃক আক্রমণের তীব্র আশঙ্কা মেইজি শাসকদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে তাঁরা কতকগুলি সংস্কার সাধন করেন। এই সংস্কারগুলি পুঁজিবাদী অর্থনীতি গরে তোলার পথ প্রশস্ত করেছিল। তাকাহাসির মতে—মেইজি নেতাদের পদক্ষেপগুলি ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাবিরোধী একটি রাজনৈতিক বিপ্লব।

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলেছিল, সেই আন্দোলনে কোন সামাজিক শ্রেণী কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—তা নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ঐতিহাসিক হল বলেছেন—যদিও কৃষক ও বণিক শ্রেণী শোগুন-বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন, তবুও এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব ছিল সামুরাই শ্রেণীর হাতে। ঐতিহাসিক ল্যাটুরেট বলেছেন—সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত সামুরাইরা নন, নিম্নবর্গীয় সামুরাইরা ১৮৬৭-৬৮ খ্রিঃ শোগুন-বিরোধী অভ্যুত্থানের গতিসঞ্চার করেছিলেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে "জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ"- এ লিখিত একটি প্রবন্ধে ঐতিহাসিক এলবার্ট ক্রেইগ সম্পূর্ণ নতুন একটি মতের উপস্থাপনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কেবলমাত্র নিম্নবর্গীয় সামুরাইরাই নন, উচ্চশ্রেণীর সামুরাইদেরও শোগুন-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাছাড়া, জঙ্গি কৃষকবিদ্রোহ, বণিক শ্রেণীর অর্থসাহায্য এবং সাৎসুমা ও চোসু গোষ্ঠীভুক্ত ডাইম্যোদের সক্রিয় অংশগ্রহন শোগুনতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। ক্রেইগের মতে বহু শ্রেণীর অংশগ্রহণ মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। জন হ্যালিডে বলেছেন—একদল পরিবর্ত্তনকামী সামন্তপ্রভুর সঙ্গে জাপানের বুর্জোয়া শ্রেণীর সমঝোতা মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘটনাটিকে একটি নতুন বিশেষত্ব দিয়েছিল। এই জোট পরিবর্তনবিরোধী পুরাতনপন্থী সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সময়ে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র কৃষকবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। পরিবর্তনকামী সামন্তপ্রভু-বুর্জোয়া জোট এই কৃষকবিদ্রোহগুলিকে শোগুন-বিরোধী আন্দোলনে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু মেইজি নেতাদের অর্থনৈতিক নীতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা আদৌ কৃষকবিদ্রোহগুলির প্রতি সহানুভুতিশীল ছিলেন না।

২) তুমি কি মনে করে মেইজি পুনঃস্থাপনে বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল?

- জাপানি লেখক টোকুটোমি সোহো জানিয়েছেন যে জাপানের সামন্ততন্ত্র ছিল ভঙ্গুর প্রকৃতির, গ্রামীণ সমাজের যারা নেতৃত্বে ছিলেন তারা অসাধারণ দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। এরাই হলেন মেজি বিপ্লবের প্রকৃত শক্তি। মেজি নেতারা নন, সমাজের মধ্য থেকে এমন অপারাজেয় শক্তি উঠে এসেছিলেন যা শোগুনতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে দেয়। মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকেরা মনে করেন জাপানের বিপ্লব হল বুর্জোয়া বিপ্লব। বিপ্লবের পরেও গ্রামীণ সমাজের অনেকে বৈশিষ্ট্য রয়ে যায়। শিবহারা টাকুজি প্রাক-প্রত্যাবর্তনের পটভুমি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন দেশে গণবিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল, নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল। তাঁর মতে, জাপানের কৃষি অর্থনীতি সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা হলেন বিপ্লবের আসল শক্তি। জনগণ সামন্ততন্ত্র বিরোধী হয়ে উঠেছিল। কনরাড টটম্যান সামন্ততন্ত্র বিরোধী শক্তির কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে সর্বত্র এই

শক্তি বাকুফু বিরোধী ছিল না, দুই দলেই শাসকগোষ্ঠী ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেনীর প্রধানরা ছিলেন, দুই দলেই সাধারণ মানুষরা ছিলেন।

১৮৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে মেজি বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সম্রাটের দরবারের অভিজাতরা, ডাইমিয়োরা, সামুরাই, গ্রাম-প্রধান। সম্পন্ন কৃষক, বণিক ও সাধারণ মানুষ। সম্রাটপন্থীরা প্রচার করেন যে শোগুন সম্রাটের অধিকার ও ক্ষমতা অবৈধভাবে আত্মসাৎ করেছেন। শিন্টো ধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে সম্রাটের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। টটম্যান মনে করেন দরবারি সভাসদরা বিপ্লবে বড় ভূমিকা নেননি। সম্রাটকে নিয়ে আন্দোলন শুরু তাঁরা মদত দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্বে এরা অনেকটা নিষ্ক্রিয় থাকেন। সম্রাটপন্থীরা সোন্নোজাই প্রচার করলেও তাদের কোনো কর্মসূচী ছিল না। তারা জাপানি জাতীয়তাবাদের কথা বলেছিল কিন্তু জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা তাদের ছিল না। বিপ্লবে একটি প্রধান গোষ্ঠী হল ডাইমিয়ো, এদের শাসন হান নামে পরিচিত। সব ডাইমিয়ো পরিবর্তন চায়নি। এদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী ছিল—বৃহৎ ডাইমিয়ো ও ক্ষুদ্র ডাইমিয়ো হাটামোটো। সাতসুমা, চোসু, তোসা ও সাগা ডাইমিয়ো শোগুনতন্ত্রের বিরোধীতায় নেমেছিল। শোগুনের সঙ্গে চোসুর সশস্ত্র সংঘাত হয়, এরাই অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শোগুনতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছিল। এদের মধ্যে জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্বার্থের সমন্বয় ঘটেছিল, শোগুনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি কামনায় এরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। গ্রামের হাটামটো শোগুন বিরোধিতায় নেমে এদের হাত শক্ত করেছিল।

এনড্রু গর্ডন মেজি বিপ্লবকে বলেছেন সামুরাই বিপ্লব, ১৭.৫ লক্ষ সামুরাই এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। ই এইচ নরম্যান মনে করেন নিম্নবর্গের সামুরাই ও বণিকরা বিপ্লব ঘটিয়েছিল। আলবার্ট ক্রেগ জানাচ্ছেন যে সামুরাইরা একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী ছিল না, তাদের সাধারণ স্বার্থও ছিল না। বিসলি জানাচ্ছেন বহু ধরনের লোক নিয়ে একটি মিশ্র শোগুন বিরোধী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, গ্রামীণ প্রধান, সম্পন্ন কৃষক, বণিক সকলে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রামের সামুরাই গোসি এদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল, গ্রামের শাসকরাও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ক্রেগের মতে, সামুরাইদের বেশিরভাগ ছিল নিম্ন সামুরাই গোষ্ঠীর লোক। গ্রামীণ সম্পন্ন কৃষক বা গ্রাম প্রধান সামুরাইদের মতো পদবি ব্যবহার করত অথবা তাদের মতো অস্ত্রবহনের অধিকার লাভ করেছিল। শহরের সামুরাইদের বিক্ষোভের সঙ্গে মিশেছিল গ্রামের সামুরাই ও গ্রাম প্রধানদের দুর্দশা। এসব আলোচনা থেকে বোঝা যায় জাপানের সামুরাইরা ঐক্যবদ্ধ কোনো শ্রেণী ছিল না, তাদের মধ্যে অন্তত তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়—উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন। এরা একযোগে শোগুনতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছিল তবে শোগুনের পক্ষেও বেশ কিছু সামুরাই কাজ করেছিল। মেজি বিপ্লবে এদের ভূমিকাকে কখনোই গৌণ করে দেখানো যায় না।

মেজি বিপ্লবে বণিকদের ভূমিকার কথা অনেক উল্লেখ করেছেন। একথা ঠিক এই আন্দোলনে বণিকরাও জড়িয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তাদের স্বাতন্ত্র্য অনেকে স্বীকার করতে চান না। মিৎসুই ও সুমিতোমো বণিক পরিবারগুলি বিরোধী নেতাদের অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কিয়োটো, এডো ও ওসাকাতে বনিকরা অর্থশালী হয়ে উঠেছিল। শোগুন নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য, একচেটিয়া বাণিজ্য, জবরদস্তি কর, অভ্যন্তরীণ শুল্ক ইত্যাদি তারা পছন্দ করত না, তা সত্ত্বেও তারা কখনও বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি। শোগুনতন্ত্রের বিরোধিতা শুরু হলে কয়েকজন বণিক সাম্রাটপন্থীদের অর্থ সাহায্য করেছিল। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে বহু বণিক বাকুফুকে অর্থ সাহায্য করেছিল।

সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন কামনা করেছিল। তাদের মধ্যে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল, কোনো সম্রাটপন্থী নিহত হলে তারা শোক প্রকাশ করত। এদের প্রতি তাদের সহানুভুতি ছিল। মন্দিরের গায়ে ও প্রাচীরপত্রে অনেক ব্যঙ্গ ও কৌতুক

প্রকাশ করা হত যার মধ্যে দিয়ে পরিবর্তনের আকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছিল; বর্তমানে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ থাকত। প্রত্যাবর্তন আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই মধ্যবর্তী স্তরের মানুষ। সামন্ত সমাজের তাঁরা বিরোধিতা করেন কারণ সেখানে তাঁদের সম্মান ও স্বীকৃতি ছিল না। এরা মনে করেন সম্রাট ও দেশের জন্য তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছেন, অবমানিত লাঞ্ছিত জাতির জন্য তাঁরা সম্মানের আসন দখলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু নিজেদের হানে নয়, জাতীয় রাজনীতিতে তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন, অবমানিত লাঞ্ছিত জাতির জন্য তাঁরা সম্মানের আসন দখলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু নিজেদের হানে নয়, জাতীয় রাজনীতিতে তাঁরা অংশ নিতে চেয়েছিলেন। সামন্ত প্রধান শোগুনের অধীনস্থ ভ্যাসাল হিসেবেদ নয়, সম্রাটের সেবক হিসেবে তাঁরা আত্মসম্মান বৃদ্ধির আশা পোষণ করেছিলেন। মেজি নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন বাকুহান ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা যাবে না, এর স্থান নেবে সম্রাটের অধীনে স্থাপিত একটি কেন্দ্রিয় শাসন।

৩) মেইজি জাপানে শিক্ষার অগ্রগতি চিহ্নিত কর।

অথবা, মেইজি জাপানে আধুনিকতার বিকাশের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যশিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা কর।

- মেইজি নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রাচীনপন্থী ধ্যানধারণাকে বিসর্জন না দিলে কখনোই আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে সফল করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার। এই সংস্কার সাধনের অন্যতম পদক্ষেপ ছিল জাপানী পাশ্চাত্য দেশে পাঠিয়ে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা। পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষার্থী পাঠাবার বিষয়টি অবশ্য শোগুন যুগ থেকেই আরম্ভ হয়। মেইজি আমলে এই বিষয়টির উপর অধিকত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মেইজি যুগের বেশকিছু বিশিষ্ট নেতা, যথা—ইটো, ইনোয়ুয়ে, মারি আরিনোরি পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার জন্য ইউরোপে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, মেইজি রাষ্ট্র জাপানীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বিদেশ থেকে নানা ধরনের বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসে। ১৮৭৩ খ্রিঃ ইউরোপ থেকে মোট ৩৪ জন খনি বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আসা হয়েছিল খনিগুলিকে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করার জন্য। আর এইচ ব্রান্টন নামে একজন ইংরেজ নৌবিজ্ঞানীকে নৌশিল্পের উন্নতিকল্পে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য বহু জার্মান চিকিৎসককে জাপানে নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৮৭৭ খ্রিঃ নাগাদ হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ই এস মর্স জাপানে আসেন। নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষোণা তাঁরই তত্ত্বাবধানে জাপানে পূর্ণতা লাভ করতে আরম্ভ করে। আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক আর্নেস্ট ফেনোলোসা ১৮৭৮ খ্রিঃ জাপানে আসেন। কিন্তু বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসার বিষয়টি মেইজি সরকারের পক্ষে যথেষ্ট ব্যসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন সরফকার বিদেশে ছাত্র পাঠানোর ওপর আরও বেশি জোরারোপ করে। এই সময় থেকেই বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় লেখা ধ্রুপদী সাহিত্য, উপন্যাস, ইতিহাস, রাজনীতি ও দর্শন সংক্রান্ত বই জাপানী ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। জাপানীদের আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটে অনুবাদের মাধ্যমে।

  প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি নজর দেওয়া হয়। শোগুনতন্ত্রের যুগে সাধারণ মানুষ বৌদ্ধ মঠ পরিচালিত বা অন্যান্য

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করতেন। সামুরাইরা সরকার ও সামন্তপ্রভূ পরিচালিত বিদ্যালয়ে কনফুসীয় ধারায় শিক্ষা লাভ করতেন। সামুরাইরা সরকার ও সামন্তপ্রভু পরিচালিত বিদ্যালয়ে কনফুসীয় ধারায় শিক্ষা লাভ করতেন। সামুরাইরা সরকার ও সামন্তপ্রভু পরিচালিত বিদ্যালয়ে কনফুসীয় ধারায় শিক্ষা লাভ করতেন। গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই পরিকল্পনার অভাব ছিল সুস্পষ্ট। মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপানে একটি সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মেইজি নেতারা মনে করেছিলেন যে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এই ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে ১৮৭১ খ্রিঃ সিদ্ধান্ত হয় যে জাপানের শিক্ষা দপ্তর দেখাশোনা করার জন্য একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে। ১৮৭২ খ্রিঃ ফরাসী ধাঁচে একটি কেন্দ্রীকৃত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য জাপানী শিক্ষাব্যবস্থায় মার্কিন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। মেইজি নেতারা জাপানী শিক্ষাব্যবস্থায় মার্কিন প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়েছিল। মেইজি নেতারা জাপানী শিক্ষাব্যবস্থায় ইউরোপীয় ও মার্কিন ভাবধারা গ্রহণ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। ১৮৭৩ খ্রিক শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করার জন্য শিক্ষাদপ্তরে তানাকা ফুজিমারো নামে একজন সহকারী মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

ফুজিমারোর উদ্যগে বিদ্যালয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মার্কিন ধারা অনুসরণ করা হয়েছিল। ত্রিস্তর শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়—প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়। এই ত্রিস্তর শিক্ষাব্যবস্থাকে সুদক্ষ করার তাগিদে জন মারে নামে এক মার্কিন বিশেষজ্ঞকে জাপানে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই সময়েই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য কতকগুলি বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়গুলিকে বলা হত নর্ম্যাল স্কুল বা "শিহান গাক্কো"। ১৮৭৯ খ্রিঃ জাপানে প্রথম পাশ্চাত্য ধাঁচে বিশ্ববিদ্যালয়, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৫ খ্রিঃ জাপানে কেবিনেট ব্যবস্থা কার্যকারী হবার সাথে সাথে জাপানী শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিত্বের আওতায় আনা হয়। মোরি অরিনোরি জাপানের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মনোনীত হন। মোরি আরিনোরির প্রচেষ্টায় জাপানে শিক্ষাব্যবস্থার যে কাঠামো তৈরী হয়েছিল, তা ১৯৪৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। ১৮৮৬ খ্রিঃ গৃহীত ব্যবস্থায় বলা হয়েছিল যে জাপানে বিশ্ববিদ্যালয়, নর্ম্যাল স্কুল, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়—এই চার ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে। ১৮৯০-এর দশকে জাপানের দ্রূত শিল্পোন্নতির সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। হাতেকলমে কাজ শেখানোর জন্য বেশ কিছু নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হত "সেম্মন গাক্কো"। বিংশ শতাব্দীর প্রারফম্ভিক পর্বে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য মেয়েদের কিছু প্রাথমিক স্কুল তৈরী হয়। কিন্তু নারী শিক্ষার প্রতি মেইজি নেতাদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালনের জন্য মেয়েদের যতটুকু শিক্ষিত হওয়া দরকার, তাদের ততটুকুই শিক্ষা দেওয়া হবে।

মেইজি জাপানে মূলত একটি রক্ষণশীল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা। কনফুসীয় মতাদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নাগরিকদের জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধ ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। রাজানুগত্য ও জাতীয়তাবাদকে সামনে রেখেই ১৮৯০ খ্রিঃ একটি রাজকীয় অনুশাসনে নতুন শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছিল। এই অনুশাসন অনুযায়ী দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সুদৃঢ় করা হয়েছিল। শিক্ষকদের পদস্থ সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। একই সাথে বলা হয়েছিল যে একজন উচ্চপদস্থ আমলার যাবতীয় রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য একজন

শিক্ষককেও পালন করতে হবে। রাষ্ট্র ও সম্রাটের প্রতি ছাত্রদের আনুগত্য বৃদ্ধি করাই একজন শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হত। শিক্ষকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি শিক্ষককে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি মেইজি জাপানে বেসরকারি উদ্যোগেও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য প্রভাব কাটিয়ে একটি স্বনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা চালানো হয়েছিল।

১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে জাপানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা বিস্তারের ফলশ্রুতি হিসাবে সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দেখা গেল যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংবাদপত্র পড়ার প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরা সরকারের সমালোচনাকারী বিভিন্ন স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করতেও শুরু করেছিল। এই প্রবণতায় সরকারি প্রতিক্রিয়া ছিল স্পষ্ট। মেইজি সরকার একটি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ও নৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। ১৮৭০-এর দশকে যে উদারপন্থী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল, তা থেকে মেইজি সরকারের বিচ্যুতি ঘটে ১৮৮০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। পরিবর্তে শিক্ষার ওপর কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এক প্রাক্তন সাৎসুমা সামুরাই মোরি আরিনোরি। মোরি আরিনোরির ১৮৮৬ খ্রিঃ থেকে ১৮৮৯ খ্রিঃ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে জাপানী পাঠ্যপুস্তকগুলির ওপর কঠোর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ করা হয় এবং শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সামরিক ড্রিল বাধ্যতামূলক করা হয়। রাজানুগত্য, বাধ্যতা ইত্যাদি কনফুসীয় গুণাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদারপন্থা ও প্রগতিশীল মানসিকতার প্রভাব যাতে ছাত্রদের আচ্ছন্ন করতে না পারে, সেদিকে মেইজি শাসকদের কড়া নজর ছিল। একথা বলা আদৌ আযৌক্তিক হবে না যে, ১৯৩০-এর দশকে যে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ জাপানের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল, তার বীজ নিহিত ছিল মেইজি জাপানে গৃহীত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে।

৪) ১৮৬৮ এবং ১৮৮৯ সালের মধ্যে জাপানের সংবিধানের জন্য গণ আন্দলনের প্রকৃতি কি ছিল?

➢ মেইজি পুনরুদ্ধারের পরবর্তীকালে জাপানের রাজনৈতিক স্তরেও বেশ কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই নতুন রাজনৈতিক বাতাবরণের প্রেক্ষাপটে ১৮৮৯ খ্রিঃ জাপানে নতুন সংবিধানের জন্ম হয়েছিল। ঐতিহাসিক ভিনাক বলেছেন, এই সংবিধানের বীজ নিহিত ছিল ১৮৬৮ খ্রিঃ "সনদভুক্ত শপথপত্র"-এর মধ্যে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পরই মেইজি শাসকেরা উক্ত শপথপত্র প্রকাশের মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশের সমস্যাবলী প্রকাশ্যে বিচার-বিবেচনা করার জন্য একটি পরিষদ গঠিত হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

১৮৭০ এবং ১৮৮০-এর দশকে জাপানে বেশ কিছু রাজনৈতিক বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছিল। এগুলির মধ্যে রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল "স্বাধীনতা ও জনগণের অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলন"। এই আন্দোলন নতুন মেইজি সরকারকে কতকগুলি কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি এনে হাজির করেছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক সচেতন নাগরিকরা মূলত দুটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ

চালিয়েছিলেন। প্রথমত কি ধরনের রাজনৈতিক কাঠামো জাপানে গৃহীত হবে? আলোচনার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল যে এমন একটি মৌলিক দলিল রচনা করা দরকার, যার থেকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যেতে পারে, আর সেই দলিলই হবে মেইজি জাপানের সংবিধান।

১৮৭২-৭৩ খ্রিঃ নাগাদ একতি সংবিধান গৃহীত হওয়ার বিষয়ে মেইজি শাসকদের মধ্যে ঐকমত্য দেখা দিল। মোটামুটি একই সময় বিভিন্ন বেসরকারি ও সরকার-বিরোধী সংগঠন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা ও একটি সংবিধানের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল। এই ধরনের দাবীগুলি প্রথমে স্থানীয় স্তরে শুরু হলেও ক্রমে সেগুলি জাতীয় স্তরে উঠে এল। জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সংবিধান সংক্রান্ত দাবিগুলিকে কেন্দ্র করেই জাপানে শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলন।

জাপানে সম্ভাব্য কোরিয়া আক্রমণকে কেন্দ্র করে মেইজি শাসকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। জাপান যখপ্ন কোরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের কর্মসূচী বাতিল করে, তখন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দুই গুরুত্বপূর্ণ মেইজি নেতা সাইগো তাকামোরি এবং ইতাগাকি তাইসুকে প্রতিবাদ করেন ও ১৮৭৩ খ্রিঃ তাঁরা সরকার থেকে ইস্তফা দেন। তাকামোরি সাৎসুমা বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিলেন। কিন্তু তোসা গোষ্ঠীভুক্ত নেতা ইতাগাকি জাপানে গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধির আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন। ১৮৭৩ খ্রিঃ ইতাগাকি "পাবলিক পার্টি অফ প্যাট্রিয়টস" নামে একতি রাজনোইতিক সংগঠন তৈরি করেন। ১৮৭৪ খ্রিঃ এই সংগঠন মেইজি সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে একটি জাতীয় আইনসভা গঠনের দাবি জানায়। ইতাগাকি, তাইসুকে ও তাঁর অনুগামীরা এই মর্মে রাজনৈতিক প্রচার চালান যে, খোলাখুলি আলোচনা এবং একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার জাতিকে শক্তিশালী করবে। ১৮৭৫ খ্রিঃ ইতাগাকির নেতৃত্বাধীন "পাবলিক পার্টি অফ প্যাট্রিয়টস" সংগঠনটির নতুন নাম হয় "সোসাইটি অফ প্যাট্রিয়টস"।

মেইজি সরকার জাতীয় আইনসভার দাবিকে গুরুত্ব দিতে রাজী ছিল না। সরকারের মধ্যে একমাত্র ওকুমা এই গনতান্ত্রিক দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। ফলে সম্রাট ও অন্যান্য মেইজি নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওকুমাকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু ততদিনে জাপানে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মেইজি সরকারের পক্ষে এই দাবিগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা আর সম্ভব ছিল না।

ইতাগাকির সংগঠন অবশ্যহ ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু নতুন সংবিধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার দাবিতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলন থেমে থাকল না। জাপানের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক স্তরে অসংখ্য সংগঠন গড়ে উঠল। এই সংগঠনগুলি তাঁদের দাবির সমর্থনে জনসভার আয়োজন করল এবং পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে থাকল। সংবিধান ও সংসদের দাবি জানিয়ে হাজার হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত অসংখ্য আবেদনপত্র সরকারের কাছে পাঠানো হল। গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ছোটদের জন্য ছড়া ও ছড়ার গান লেখা হতে থাকে। গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের বহু সক্রিয় কর্মী তাঁদের লেখায় কনফুসীয় ধারণার অনুযায়ী প্রজার প্রতি শাসকের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে নতুন রাজনৈতিক ধ্যানধারণার সূচনা করেন।

নগরকেন্দ্রিক কতকগুলি পাঠচক্র ১৮৮০-র দশকের জাপানে গড়ে ওঠে। এই পাঠচক্রগুলি কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক আধিকার আন্দোলন সক্রিয় হয়েছিল। সেগুলি গড়ে উঠেছিল মূলত সাংবাদিক ও শিক্ষকদের উদ্যোগে। শহরাঞ্চলের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভিত্তি করেই এই পাঠচক্রগুলি তৈরি হয়। কিইও বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছিল ফুকুজাওয়া ইউকিচির

নেতৃত্বাধীন পাঠচক্র। একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলেও তৈরি হয় অসংখ্য সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র ও রাজনৈতিক সমিতি। সমস্ত সংগঠনগুলিরই দাবি ছিল নতুন সংবিধান ও একটি প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা। শাসনতন্ত্রে অংশগ্রহণের দাবি সমাজের নিম্নতর স্তর থেকেও উঠে আসতে শুরু করেছিল।

বিভিন্ন সংগঠনগুলির মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্ক মূলত একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল—সম্রাটের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা। আমলাতন্ত্র, আইনসভা এবং জনসাধারণ—এদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্রাটের ভূমিকা কি হবে, তা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন উঠে এসেছিল। রাজনৈতিক বিতর্কে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই মনে করেছিলেন যে, নতুন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় সম্রাট সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। কতকগুলি স্থানীয় সংগঠন আবার সম্রাটের ক্ষমতা সঙ্কোচনের পক্ষে সরাসরি প্রচাত্র চালিয়েছিলেন।

গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন জাপানে তার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল ১৮৮১ খ্রিঃ। অসংখ্য স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৮৮১ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে টোকিওতে একটি জাতীয় সম্মেলনে মিলিত হন। এই সম্মলেনে "জিয়ুটো" বা উদারনৈতিক দল একটি নতুন রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই রাজনৈতিক দলটির নেতৃত্বে ছিলেন ইতাগাকি। "জিয়ুটো" জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলেছিল এবং সংবিধান সংক্রান্ত আলোচনা সভা আহবান করার দাবি সরকারের কাছে রেখেছিল। ১৮৮২ খ্রিঃ ওকুমা শিগেনোবুর নেতৃত্বে আর একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এই দলটির নাম ছিল "কাইশিনটো" বা প্রগতিশীল দল। "কাইশিনটো" ব্রিটেনের ধাঁচে একটি শক্তিশালী সংসদ চেয়েছিল। এই দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও দুটি বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অভিন্ন। প্রথমত, দুটি দলই একটি জাতীয় প্রতিনিধি সভা গঠনের দাবিকে এবং সংবিধানের দাবিকে সমর্থন করেছিল। দ্বিতীয়ত, দুটি দলই জাপানী রাষ্ট্রের ঐক্য ও অখন্ডতার প্রতীক হিসাবে সম্রাটের প্রতি আকুন্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭০ ও ৮০-র দশকে মেইজি রাষ্ট্র দুভাবে সাড়া দিয়েছিল। প্রথমত, সরকার কঠোর দমনমূলক আইনের সাহায্যে গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার লঙঘন করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মেইজি নেতারা জনমত শান্ত করার তাগিদে অন্তত একটি রক্ষণশিল সংবিধান রচনা করতে তৎপর হয়েছিলেন।

ইটো হিরোবুমির ওপর সংবিধান রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। বিভিন্ন দেশের সংবিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সম্যক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ইটো ১৮৮২ খ্রিঃ মার্য মাসে ইউরোপে যান। জার্মানির রক্ষণশীল সংবিধান ও বিসমার্কের রক্ষণশীল ব্যক্তিত্ব ইটোকে আকৃষ্ট করেছিল। চোসু ইটো হিরোবুমি নিজেও ছিলেন ছিলেন রক্ষণশীল মেজাজের মানুষ। কর্তৃত্ববাদী ঐতিহ্য এবং উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব উভয়দেশের মধ্যে এক অসামান্য সাদৃশ্যের অবতারণা করেছিল। তাই এই নতুন সংবিধানের প্রকৃতি যে পুরোপুরি রক্ষণশীল হবে, তা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল। ফলে মেইজি সংবিধানে সম্রাটের কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতার একটি বিশেষ স্থান থাকা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

৫) ১৮৮৯ সালে মেইজি সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

- ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে মেজি সংবিধান প্রবর্তিত হয়, ১৮৯০ খ্রিঃ এই সংবিধানের অনুযায়ী আইনসভা ডায়েট গঠিত হয়। রিচার্ড স্টোরি জানাচ্ছেন যে সংবিধানের রচয়িতারা

সকলে কর্তৃত্ববাদী মনোভাবাপন্ন। আশির দশকে শাসক শ্রেণীর মধ্যে কনফুসীয় আদর্শের প্রতি নতুন করে আনুগত্য তৈরি হয়, এরা পশ্চিমি ধ্যানধারণাকে পছন্দ করেননি। ১৮৯০ খ্রিঃ সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত আদেশে এর প্রতিফলন ঘটেছিলেন। করুণা, দয়া, আনুগত্য ইত্যাদির ভিত্তিতে জাতীয় নৈতিক বিধি রচিত হয়। অভিজাততন্ত্র নতুন সংবিধানে যেসব উদারনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার বিরুদ্ধে সুরক্ষা হিসেবে নতুন নীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই সংবিধানে জাতীয় রাজনীতিতে সম্রাটের অবস্থানকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়। সংবিধানের ১-১৭ অনুচ্ছেদে সম্রাটের বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। সম্রাট হলেন দৈবী ক্ষমতার অধিকারী। সাম্রাজ্যের সব বেসামরিক ও সামরিক পদে তিনি কর্মচারীদের নিযুক্ত করবেন এবং রাদের পদচ্যুত করার অধিকারও তাঁর থাকবে। তিনি হবেন শাসন ও বিচার বিভাগের প্রধান, সৈন্যবাহিনীর প্রধান এবং আইনসভার সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি আইন প্রণয়ন করবেন। সম্রাট প্রয়জনবোধ করলে জরুরি আইন জারি করতে পারবেন, তবে আইনসভা অনুমোদন না করলে আইনগুলি বাতিল হবে। কোনো বিল সংসদে গৃহীত হলে সম্রাটের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে, সম্রাটের আনুমোদন না পেলে কোনো বিল আইনে পরিণত হবে না। প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সম্রাট বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করবেন। তিনি বিচার বিভাগের প্রধান হবেন, বিচারকরা সম্রাটের অধীনে থেকে বিচারকার্য সমাধা করবেন। সরকারের বিচার বিভাগ তাদের কাজকর্মের তদারকি করবে।

বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা, যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে সম্রাট বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করবেন। তিনি কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবেন, আবার কোনো দেশের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করার অধিকারও তাঁর থাকবে। বিচার ব্যবস্থার প্রধান হিসেবে সম্রাট দন্ডাদেশ মকুব বা ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার ভোগ করবেন। দেশের কৃতী ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের অধিকারও তাঁর ছিল। দেশের কর ব্যবস্থার ওপর সম্রাটের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তিনি কোনো কর স্থাপন ও সংগ্রহের অধিকার লাভ করেননি। জাপানে কর স্থাপিত হত আইন বিভাগের মাধ্যমে। দেশের বাজেট তৈরি বা আয়-ব্যায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্রাটের কোনো অধিকার ছিল না, রাষ্ট্রের আয়-ব্যায় নির্ধারণের অধিকার ছিল আইনসভার হাতে। সংবিধান সংশোধনের অধিকারও সম্রাটকে দেওয়া হয়নি। তিনি শুধু সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব দিতে পারবেন, আইনসভা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার লাভ করেছিল। সংবিধান অনুযায়ী সম্রাটের হাতে শাসন, আইন, বিচার ও সামরিক বিভাগের ভার ছিল, ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনুসরণ করা হয়নি কারণ সম্রাট হলেন ঐশী ক্ষমতার অধিকারী, অনন্তকাল ধরে সম্রাটদের শাসন চলেছে।

সংবিধানের ১৮-৩২ অনুচ্ছেদে জনগণের অধিকার ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছিল। সরকার সাংবিধানিক আইন পাশ করে জনগণকে কতকগুলি অধিকার দিয়েছিল। সব নাগরিক সরকারি ও বেসরকারি কাজ করতে পারবে, সরকার বেআইনিভাবে কোনো নাগরিকদের গ্রেপ্তার বা আটক করে রাখতে পারবে না, বেআইনিভাবে নাগরিকদের গৃহ তল্লাসিও নিষিদ্ধ হয়। সব নাগরিককে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়। জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারবেন, সভা-সমিতিতে যোগদানের ব্যাপারেও কোনো বাধা থাকবে না। জনগণকে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এসব অধিকার দেখা দিলেও বলা হয় সরকার জরুরী অবস্থা দেখা দিলে বা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকলে সব অধিকার বাতিল বা স্থগিত করতে পারবে। প্রত্যেকটি অধিকারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়েছিল। জনগণের অধিকার থাকা সত্ত্বেও সম্রাট জরুরি অবস্থায় বা যুদ্ধের সময় ব্যবস্থা নিতে পারবে। দেশের নাগরিককে ভোটাধিকার লাভ করেছিল, জনগণ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়।

সংবিধানের ৩৩-৫৪ নম্বর অনুচ্ছেদে সংসদের কথা বলা হয়। ইম্পিরিয়াল ডায়েটের ছিল দুই কক্ষ—হাউস অব পিয়ার্স ও হাউস অব রিপ্রেসেনটেটিভস। উচ্চকক্ষের সব সদস্য ছিলেন অভিজাত, মোট ৩৬৮ জন সদস্যের মধ্যে ২০১ জন ছিলেন বংশানুক্রমিক অভিজাত সদস্য, ১২২ জন সম্রাট কর্তৃক মনোনীত আর বাকি ৪৫ জন ছিলেন সর্বোচ্চ করদাতাদের প্রতিনিধি। সংবিধানে বলা হয় যে দুই কক্ষ হবে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন, কার্যত নিম্নকক্ষের চেয়ে উচ্চকক্ষের ক্ষমতা বেশি হয়ে যায়। নিম্নকক্ষে পাশ হওয়া বিল উচ্চকক্ষ বাতিল করতে পারত। সংবিধান সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি প্রবর্তন করেনি, সম্পত্তিবান মাত্র ১ শতাংশ মানুষ ভোটাধিকার পেয়েছিল। নিম্নকক্ষের ৩৭৯ জন সদস্য ছিলেন নির্বাচিত। মেজি নেতারা ভোটাধিকার সীমিত রেখে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাখার ব্যবস্থা করেন। সংবিধানে আইনসভাকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়, তবে গৃহীত বিল সম্রাটের অনুমোদন না পেলে আইনে পরিণত হবে না। এভাবে আইনসভা গঠন করে ইটো রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

মেজি সংবিধানে মন্ত্রীপরিষদ গঠনের সুপারিশ ছিল(ধারা ৫৫), সংবিধানে বলা হয় সম্রাট মন্ত্রীপরিষদ গঠন করবেন। একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, তিনি সব বিভাগের কাজের তদারকি করবেন। ক্যাবিনেট ব্যবস্থার কথা সংবিধানে স্থান পায়নি, মন্ত্রীরা তাদের কাজের জন্য পৃথকভাবে সম্রাটের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। সম্রাটের স্বাক্ষরিত আদেশে তাঁরা প্রতিস্বাক্ষর করবেন এবং তাঁদের বিভাগের কাজের জন্য সম্রাটের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, সংসদের কাছে মন্ত্রীদের কোনো দায়বদ্ধ থাকবে না। সংবিধানে বলা হয়নি যে মন্ত্রীরা সংসদের সদস্য হবেন, সংসদের সদস্যপদ আবশ্যিক ছিল না। তবে মন্ত্রীরা সংসদের উভয়কক্ষে আসন গ্রহণ করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আলোচনায় অংশ নিতে পারতেন। মন্ত্রী পরিষদ থাকলেও সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল প্রিভি কাউন্সিলের হাতে। সংবিধান প্রবর্তিত হলে সরকার আইন করে বলেছিল যে যুদ্ধমন্ত্রী বা স্থল ও নৌবাহিনীর প্রধানরা হবেন সামরিক বাহিনীর লোক। সামরিক বিভাগের বাজেটের ওপর সংসদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না । এই ব্যবস্থা জাপানের গণতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি।

৬) সাতসুমা বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

- মেজি প্রত্যাবর্তনের পর জাপানের নেতারা সামন্ততন্ত্রের অবসানের অপর জোর দিয়েছিলেন। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষক ও যোদ্ধা সামুরাই শ্রেণী। নতুন ব্যবস্থায় কৃষকদের খাজনা বেড়েছিল, এজন্য তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। কৃষকেরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তবে এসব অভ্যুত্থান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না। স্থানীয় অভাব অভিযোগ দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে কৃষকেরা বিদ্রোহের পথে পা বাড়াত। মেজি সংস্কারের ফলে সামুরাই শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ তাদের সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছিল। এই সময় জাপানে মোট লোকসংখ্যা হল ৩৪ মিলিয়ন, এর মধ্যে সামুরাইদের সংখ্যা হল ১.৭৫ মিলিয়ন। টোকুগাওয়া যুগে জাপানে যখন যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না, সামুরাইরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। মেজি যুগের গোড়ার দিকে দেশের শিল্পায়নে এবং শাসন ব্যবস্থায় এই শ্রেণি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। বলা হয় সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রটির ওপর সামুরাইদের খুব বেশি প্রভাব ছিল।

সামুরাইদের অনেকে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, অনেকে বাণিজ্য ও শিল্পকে আশ্রয় করে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। কিন্তু এদের বাইরে বিশাল সংখ্যক সামুরাই ছিল যারা নতুন ব্যবস্থার সংঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। প্রত্যাবর্তনের আগে এদের সামাজিক মর্যাদা, উচ্চ বেতন ও ভাতা ছিল। নতুন ব্যবস্থায় তাদের সামান্য পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ভদ্রভাবে জীবন যাপনের জন্য তা যথেষ্ঠ ছিল না। মেজি প্রত্যাবর্তনের অল্প কয়েকবছর পরে তাদের পেনশন বন্ধ করে দিয়ে এককালীন কিছু অর্থ দেওয়া হয় যা তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য পর্যাপত ছিল না। মেজি সরকারের বিরুদ্ধে সামুরাইদের আরও অভিযোগ ছিল। মেজি সরকার নির্দেশ জারি করেছিল যে পুলিশ বা সমরিক বাহিনীর লোক ছাড়া কেউ অস্ত্র বহন করতে পারবে না। সামুরাইরা ঐতিহ্যগতভাবে সঙ্গে তরবারি রাখত, এই অস্ত্র বহনের অধিকার তারা হারিয়েছিল। সামুরাইদের আত্মমর্যাদা প্রচন্ডভাবে আহত হয় যখন সরকার আইন করে সর্বশ্রেণীর মানুষকে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের অধিকার দেয়। এই অধিকার যুগ যুগ ধরে সামুরাইরা একচেটিয়াভাবে ভোগ করত।

মেজি যুগের শুরু থেকে সামুরাইদের এসব অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্তভাবে অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটতে থাকে। এসব অভ্যুত্থানের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটেছিল ক্যুসুতে ১৮৭৭ খ্রিঃ, এখানে সাতসুমাতে সামুরাই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন সাইগো তাকামোরি। সাইগো মেজি প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই ব্যক্তিটি মানসিকতায় ছিলেন কঠোর প্রকৃতির ও উগ্র জাতীয়তাবাদী। এই বিশিষ্ট নেতা সরকার থেকে পদত্যাগ করে সামুরাই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন, সরকার তাঁকে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে।

মেজি সরকারের মধ্যে এইসময় দুটি গোষ্ঠী ছিল, জঙ্গি, উগ্র জাতীয়তাবাদী যুদ্ধবাজদের নেতৃত্ব দেন সাইগো। অন্য গোষ্ঠীটি ছিল শান্তিবাদী, এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন চোসু নেতা ইয়ামাগাতা অরিতোমো। অরিতোমো বিদেশ থেকে ফিরে এসে জাপানের পুনর্গঠনের ওপর জোর দেন। অন্যদিকে সাইগো ও তার অনুগামীরা কোরিয়াতে সামরিক অভিযান পাঠানোর প্রস্তাব দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কোরিয়া দখলের মাধ্যমে সামুরাই শ্রেণীর কাজ ও মর্যাদার পুনরুদ্ধার করা। কিন্তু কোরিয়া আক্রমণ করলে রাশিয়া হস্তক্ষেপ করবে এই সম্ভবনায় সরকার এই প্রস্তাব বাতিল করে। শান্তিবাদী গোষ্ঠীর জয় হয়, সাইগো ও তার অনুগামীরা পদত্যাগ করে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তিনি আবার সরকারে ফিরে আসেন। অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তার মতবিরোধ বৃদ্ধি পায়। তিনি বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষানীতির বিরোধী ছিলেন কারণ তাঁর মনে হয়েছিল এর ফলে জাপানের ঐতিহ্যবাহী সামুরাই শ্রেণীর সর্বনাশ হতে চলেছে। সামুরাই শ্রেণীর লোকেরা সত্তরের দশকের সংস্কারকে ভালো চোখে দেখেনি।

এই পটভূমিকায় ১৮৭৭ খ্রিঃ সাইগো তাকামোরির নেতৃত্বে সাতসুমাতে সামুরাইরা বিদ্রোহ করেছিল। সরকারি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন চোসু নেতা ইয়ামাগাতা অরিতোমো। তিনি সাতসুমা বিদ্রোহ দমন করেন, উভয়পক্ষে প্রায় তিরিশ হাজার লোক প্রাণ দিয়েছিল। এই যুদ্ধে সাইগো পরাজিত হয়। সাইগো বলেছিলেন যে তিনি সম্রাটের আদেশের বিরোধীতা করছেন না, তিনি তাঁর "দুষ্ট পরামর্শদাতাদের" সরানোর প্রয়াস করছেন। জাপানের এই মানসিকতা ছিল অনেক পুরনো, উগ্র জাতীয়তাবাদীরা এই ধারণাকে পোষণ করে হিংসার আশ্রয় নিতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে এই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল। বেতারে সম্রাতের আত্মসমর্পনের নির্দেশ অনেকে তাঁর মন্ত্রীদের কাজ বলে গণ্য করেছিল। সাইগোর বিদ্রোহ ছিল পুরোনো সামন্ততন্ত্রের শেষ প্রতিরোধ, বলা যায় সামন্তব্যবস্থার অস্তরাগ। এর অন্য তাৎপর্য হল উগ্র জাতীয়তাবাদী ও জঙ্গিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল এই বিদ্রোহে।